আল কোরআন ও আধুনিক যুগের চাহিদা

﴿القرآن الكريم ومقتضيات العصر الحديث﴾

[বাংলা - bengali - البنغالية]

জহির উদ্দিন বাবর

সম্পাদানা : **ইকবাল হোছাইন মাছুম**

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ القرآن الكريم ومقتضيات العصر الحديث ﴾

« باللغة البنغالية »

ظهير الدين بابر

مراجعة: إقبال حسين معصوم

2010 - 1431

islamhouse.com

আল কোরআন ও আধুনিক যুগের চাহিদা

প্রতিটি মানুষের ভেতরেই এই প্রশ্নটি ঘুরপাক খায় যে, বর্তমান যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে কোরআনুল কারীমের যথার্থতা কতটুকু। কেউ কেউ এ ভাবনায় বিভোর হয়ে কূল-কিনারা না পেয়ে থমকে যান। কারণ দীর্ঘদিন যাবত ইসলামবিদ্বেষীরা কোরআনুল কারীমের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে কোরআনী নেজামকে সেকেলে ও আধুনিক যুগে অকেজো বানিয়ে দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত। অথচ বাস্তবতা হলো, কোরআনুল কারীম শুধু বর্তমান যুগই নয় ভবিষ্যতের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার মতো যথেষ্ট যোগ্যতা রাখে। কোরআনের বর্ণনা ধারার অলৌকিকত্ব এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে তুলনাহীন হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। আল্লাহর চিরন্তন ঘোষণা 'লা রাইবা ফী-হ' নেই কোনো সন্দেহ তাতে–এর সত্যতাও প্রশ্নাতীত। কোরআনুল কারীম সমগ্র মানবতার জন্য একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। আজকের আনবিক যুগের প্রয়োজনও কোরআন যথার্থভাবে পূরণ করতে সক্ষম। তবে শর্ত হলো, কোরআন নাজিলের শান ও গুরুত্ব আমাদের মাঝে বদ্ধমূল হতে হবে। এমন যেন না হয়–আমরা নিজেরা পরিবর্তন হই না বরং কোরআনকেই পাল্টিয়ে দিই।

কোরআন নাজিলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

এটা একটা স্বীকৃত বিষয় যে, বর্তমান যুগে মুসলমানরা জাতি হিসেবে, বিশেষত মুসলমানদের যুবক শ্রেণীটি যারা প্রত্যেক যুগে জাতির ভাগ্যকে আলোকিত করে, কোরআনুল কারীমের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা নিজেরাই যুগের ধর্মদ্রোহী থাবার শিকার। অন্যদেরকেও তারা নিজেদের ফাঁদে আটকে দিতে তৎপর। সাধারণত কিতাবুল্লাহকে হেদায়াত ও আমলের জন্য নয় বরং নিছকই গতানুগতিক বরকত হাসিলের জন্য তেলাওয়াত করা হয়। আল্লামা ইকবাল যথার্থই বলেছেন, 'আজকের মুসলমান কোরআনী হিকমত অনুযায়ী জীবনকে সাজায় না, সূরা ইয়াসীন জাতীয় কিছু আয়াত শুধু এজন্যই পড়া হয় যে, এর দ্বারা রোগীর আরোগ্য লাভ হয়।'

এটা তো গেল সাধারণ মুসলমানদের কথা। আপনি যদি উম্মাহর বিশেষ শ্রেণী তথা ওলামায়ে কেরামের কথা আলোচনা করেন তাহলে দেখবেন কিছুসংখ্যক আলেম কোরআনকে শুধুই কয়েকটি মতবিরোধপূর্ণ মাসায়েল সমাধানের আঙ্গিকে উপস্থাপন করে থাকে। অথচ কোরআনুল কারীম তার নাজিলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিজেই স্পষ্টভাবে বলছে,

﴿ كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٢٩ ﴾ ص: ٢٩

'হে নবী! আপনার প্রতি এই বরকতপূর্ণ কিতাব নাজিল করেছি যাতে লোকেরা এর আয়াতসমূহে চিন্তা-ভাবনা করে এবং জ্ঞানীরা যেন তা থেকে শিক্ষা হাসিল করে।' (সূরা সদ : ২৯)

এই আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এই কোরআন যা আল্লাহর এক বরকতময় কিতাব তাকে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও মনোযোগের সঙ্গে পড়বে। তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে না। এটাকে মতবিরোধপূর্ণ মাসআলার একমাত্র সমাধান মনে করবে না। পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টির মাধ্যম বানাবে না। বরং এর মূল বিষয়বস্তু, হিকমতপূর্ণ আহকাম এবং এর রূহ বুঝার চেষ্টা করবে। কোরআনুল কারীম সংবাদ দিচ্ছে, এই পবিত্র কিতাব মতবিরোধ, সংঘাত, বিভেদ ও বৈপরীত্বের ঊর্ধ্বে। যেমন পঞ্চম পারায় বলা হয়েছে,

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا ٨٢ ﴾ النساء: ٨٢

'তারা কি কোরআনুল কারীমের মাঝে চিন্তা করে না?' এ কিতাব যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো তরফ থেকে হতো তাহলে এতে অধিক পরিমাণে বৈপরীত্ব পাওয়া যেত। (সূরা নিসা : ৮২)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أَمۡ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقۡفَالُهَآ ٢٤ ﴾ محمد: ٢٤

'তারা কি কোরআনে চিন্তা করে না অথবা তাদের অন্তরে তালা লেগে আছে।' (সূরা মুহাম্মাদ : ২৪)

উল্লিখিত আয়াতসমূহে কোরআনুল কারীমকে বরকতময় কিতাব আখ্যা দেয়া হয়েছে এবং তাতে চিন্তা ও গবেষণা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে অন্য এক স্থানে কোরআনকে রহমত ও শেফা হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧ قُلۡ بِفَضۡلِ ٱللَّهِ وَبِرَحۡمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلۡيَفۡرَحُواْ هُوَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ٥٨ ﴾ يونس: ٥٧ - ٥٨

‘হে লোকসকল! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে নসীহত, অন্তরের অসুস্থতার শেফা এবং মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত এসেছে। হে নবী (বলে দিন) এই কিতাব যা আল্লাহ তাআলার ফযল ও রহমতের দ্বারা অবতীর্ণ হয়েছে লোকদের উচিত এর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া। লোকেরা যা জমা করেছে এর চেয়ে অনেক উত্তম এই কিতাব।’ (সূরা ইউনুস : ৫৭-৫৮)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআনুল কারীমকে সমস্ত দুনিয়ার জন্য রহমত, মুমিনের শেফা এবং করুণা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি যেন কোরআনুল কারীম পেয়ে সন্তুষ্টি ও খুশি প্রকাশ করেন। অথচ গোনাহগার উম্মত আমরা বলছি কোরআনুল কারীম পুরনো ও জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে। তা বর্তমান যুগের প্রয়োজন পূরণ করতে অক্ষম। এটাকে বর্তমান যুগের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিতে হবে। তাদের এই আকীদাকে সহীহ ধরলে এ কথাও মেনে নিতে হবে যে, মহান আহকামুল হাকিমীনের পবিত্র সত্তাও পুরনো হয়ে গেছে। (নাউযুবিল্লাহ) অথচ সেই সত্তা অনন্ত-অসীম কাল ধরে আছেন, অনন্ত অসীম কাল থাকবেন, তিনি চিরঞ্জীব ও সদা জাগ্রত। অথবা তাদের কথা মতো এটাও বলা যেতে পারে যে, কোরআনুল কারীমের ধারক-বাহক মহানবী মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত পুরনো হয়ে গেছে। এ যুগে তাঁর নবুওয়ত প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম নয়। বরং তাঁর স্থলে একজন নতুন নবী ও শরীয়তের প্রয়োজন। কিন্তু এ কথা মনে করা কুফুরী ও গোমরাহী। কেননা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তা ওই 'সীরাজাম মুনীরা’ যা কখনও উদয় কিংবা অস্তের প্রয়োজন নেই। সুতরাং তাঁর কোরআন ও তালীম চির ভাস্বর। জানা প্রয়োজন, আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তা, তাঁর আসমানী বিধি-বিধান, তাঁর সর্বোত্তম নবী ও রাসূলের পবিত্র সত্তা এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত শরীয়ত সবকিছুই অকেজো ও জীর্ণশীর্ণতার উর্ধ্বে। এটা এমন এক সত্য ও বাস্তবতা যে, কিয়ামত পর্যন্ত স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে থাকবে। আধুনিক বস্তুবাদী দুনিয়ার সমস্ত প্রয়োজন, বিজ্ঞানের যাবতীয় উৎকর্ষ, সাফল্য ও আবিষ্কারের ধাঁধাঁ সবই এর অনুগত ও অনুগামী হবে।

কোরআনী আমানত

একথা জানা প্রয়োজন যে, কোরআনুল কারীমের মহান বোঝা বহন করার মতো কোনো শ্রেণী সৃষ্টিকুলের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়নি। মহান সেই আমানত নিজ কাঁধে বহন করেছে একমাত্র আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি আশরাফুল মাখলুকাত–মানবজাতি। তাদেরকে পৃথিবীর খলিফাও বলা যায়। একমাত্র তাদের ওপরই এ আমানত অর্পিত হয়েছে। কেন তাদের ওপর এই আমানত অর্পণ করা হলো? এর একমাত্র কারণ হলো আমানতের যে বোঝা তা মহব্বতে এলাহীরই অপর নাম। এজন্য প্রকৃত অর্থে মহব্বতে এলাহীই মানুষের ওপর সোপর্দ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ﴾ التين: ٤

‘নিশ্চয় আমি মানুষকে সুন্দর অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছি।’ (সূরা ত্বীন : ৪)

কোরআনুল কারীমের দরস দ্বারা প্রত্যেক তেলাওয়াতকারীর পীপাসা দূর হবে। প্রত্যেক মুসলিম সন্তানের নিজের জীবনের বিধি-বিধান জানা হয়ে যাবে।

হেরা পর্বতের গুহায় ওহী অবতরণের উদ্দেশ্য ছিল শুধুই মুসলমান নয়, আন-নাস তথা সমগ্র মানবজাতির জীবনবিধানের মূল ভিত্তি হিসেবে। তাওহীদের সন্তানেরা সমস্ত সৃষ্টিজীবের ওপর মর্যাদাবান সাক্ষী হিসেবে গণ্য হবে। দুনিয়ার খেলাফতের যোগ্য উত্তরাধীকারী হিসেবে গণ্য হবে। দুনিয়ার সবকিছু থাকবে তাদের অধীনে। অথচ দৃশ্যপট হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজকের মুসলমান শুধুই মুসলিম নামের সৌরভ ধারণ করে আছে, রূহানী ক্ষমতা তাদের বিলুপ্ত হয়ে গেছে আগেই। এর কারণ হলো আমরা কোরআনুল কারীমের রূহানী শিক্ষা ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। এর ওপর আমল করা ছেড়ে দিয়েছি। ইসলামী শরীয়াহকে ঠাট্টা-বিদ্রুপের বস্তু বানিয়ে নিয়েছি। এমনকি কোরআনুল কারীমের সঙ্গে তামাশা করার দুঃসাহসিকতা পর্যন্ত প্রদর্শন করছি। (নাউযুবিল্লাহ) আজও আমরা কোরআনুল কারীমের যথার্থ উত্তরাধিকারী হতে পারি, দুনিয়ার সবকিছু আমাদের অধীনে আসতে বাধ্য। তবে শর্ত হলো–ইকবালের ভাষায় ‘তুমি যদি মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি আনুগত্যশীল হও, তবেই আমি তোমার সঙ্গে। এ দুনিয়ার যা কিছু আছে লওহ-কলমসহ সবকিছু তোমার।’

কেননা কোরআনুল কারীমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, ‘আসমান-জমিনে যা কিছু আছে সবকিছু তোমার অনুগত করে দেয়া হয়েছে।’ যদি আমরা অঙ্গীকার করি যতক্ষণ আমাদের চোখে নূর, অন্তরে সজীবতা, কানে শ্রবণশক্তি, জিহ্বায় বাচনক্ষমতা, পায়ে চলনশক্তি অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ প্রত্যেক মুসলমানের প্রধান দায়িত্ব হলো সে কোরআনুল কারীম পড়বে এবং পড়াবে। নিজে বুঝবে এবং অন্যকে বুঝাবে, এর ওপর যথার্থভাবে আমল করবে। মাথায় বোঝা থাকলে কোরআনের, অন্তরে ইশক থাকলে কোরআনের, হাতে কড়ি, পায়ে বেড়ি–সবই যেন হয় কোরআনের। এটাই মুমিন জীবনের উদ্দেশ্য।

সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত!
কোরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ آل عمران: ١١٠

তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। (তোমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য হলো) তোমরা লোকদেরকে সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে।' (সূরা আলে ইমরান : ১১০)

মূলত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেণ এজন্য যে, আমরা লোকদেরকে সৎ কাজের আদেশ করব, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখব। কিন্তু আমাদের অবস্থা তো হলো আমরা অন্যের গোলাম হয়ে আছি। অন্যের কথা মতো পরিচালিত হচ্ছি। অন্যদেরকে আমরা মন্দ থেকে কী রুখব, নিজেরাই তো মন্দে ডুবে আছি আকণ্ঠ। চারিত্রিক অধঃপতনের দিক থেকে আমরা নিকৃষ্ট জাতির খেতাব পাওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। দুনিয়ার দেড়শ কোটি মুসলমান যদি তাদের অন্তরে তাওহীদের আকীদা পোক্ত করে নেয় এবং এর শিক্ষাকে জীবনের পাথেয় বানিয়ে নেয় অথবা তা অনুযায়ী আমল করে, তাহলে দুনিয়ার কোনো জাতির এই শক্তি নেই যে, তাদের দিকে চোখ তুলে তাকাবে। সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা, খোদাদ্রোহী রাশিয়া, জায়নবাদী ইহুদী গোষ্ঠীর এমনকি শক্তি আছে যে, তাদের ওপর কর্তৃত্ব করবে। প্রথম কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাস দখল রাখবে বছরের পর বছর!

যখন কোনো জাতি 'লা ইলাহা' এর বিষয়বস্তু বুঝে তা অনুযায়ী আমল করে তখন তার সুপ্ত যোগ্যতার বিকাশ ঘটে এবং অপরিমেয় শক্তি জন্ম নেয়। এরপর সে যখন 'ইল্লাল্লাহ' বলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধানের সামনে নিঃশর্ত মাথা ঝুঁকায়, তখন তাদের অস্তিত্ব সমগ্র দুনিয়ার জন্য রহমত হয়ে যায়। শক্তির অপর নাম 'জালাল' আর তাকওয়ার অপর নাম 'জামাল'। সাহাবায়ে কেরামের গুণ বর্ণনা করে কোরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে

﴿ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ الفتح: ٢٩

'তারা কাফেরদের জন্য বজ্রকঠোর, কিন্তু পরস্পরের প্রতি দয়াশীল।' (সূরা ফাতহ : ২৯)

এর মধ্যে এ দুটি গুণ (জালাল ও জামাল) প্রতিফলিত হয়েছে। যে জাতির মধ্যে এ দুটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য জমা হয় তারা কারো কর্তৃত্বাধীন হওয়ার পরিবর্তে দুনিয়ার ওপর কর্তৃত্বশীল হয়ে যান। অন্যান্য জাতিকেও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পথে চলতে বাধ্য করে। সমগ্র সৃষ্টি তাদের অনুগত হয়ে যায়। ইসলামী ইতিহাসের সোনালী অধ্যায়গুলো এ কথার জ্বলন্ত প্রমাণ। আজকের দিনে আমাদের মধ্যে জালাল যেমন নেই, তেমনি জামালও অনুপস্থিত। জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেমন কোনো ভাবনা নেই, তেমনি নেই আমলী আলোর কোনো বিচ্ছুরণ। ইসরাইল আমাদের মসজিদে আকসা জ্বালিয়ে দেয় অথচ আমরা নির্বিকার। আমাদের সেই স্বাধীনচেতা মনোভাব ও স্পৃহা লুপ্ত হয়ে গেছে যার মাধ্যমে আমরা 'তোমরাই বিজয়ী হবে' কোরআনের শাশ্বত সেই সুসংবাদের অধিকারী হয়েছিলাম।

এ সব কিছুর কারণ হলো, আমাদের মধ্যে অজ্ঞতার ছাপ বাকী রয়ে গেছে। ইসলামী রূহ আমাদের থেকে বিলুপ্ত হযে গেছে। আমরা নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম আদর্শকে বেমালুম ভুলে গেছি। পবিত্রতম শরীয়তের আনুগত্য আজ আমাদের কাছে কষ্টের বস্তু বলে মনে হচ্ছে।

অজ্ঞতার একটি আলামত

অজ্ঞতা ও জাহালতের এটাও একটা আলামত যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ যখন পেশ করা হয় তখন এর বিপরীতে পুরনো রীতিনীতি উপস্থাপন করা হয়। জাহেলিয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে আরবের জীবনবিধানই নয় বরং প্রতিটি অনৈসলামিক নেজাম ও জীবনই এক একটি জাহেলিয়াত। যার উৎসস্থল নবুওয়ত, কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নতে রাসূলুল্লাহর ভিন্ন অন্য কিছু, তাই জাহালতের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী রীতি-নীতি ও জীবনধারার পরিপন্থী যা কিছু, জাহেলী আরব কিংবা ইরানী প্রথা, ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ কিংবা মিসরীয় ফেরআউনী কাল, পুঁজিবাদী শোষণ কিংবা সাম্যবাদী আগ্রাসন কোনোটিই জাহালতের বাইরে নয়। এক কথায় মুসলমান জাতির শরীয়ত পরিপন্থী জীবন, প্রথা, চরিত্র, আবেগ ও স্পৃহা তা প্রাচীন আধুনিক কিংবা অত্যাধুনিক যাই হোক, সবই জাহেলিয়াতের মাঝে গণ্য হবে। কারণ তা কোরআনী চাহিদার এবং কোরআনী রূহের পরিপন্থী। এটাই কুফরীর হালত। কুফর শুধু আল্লাহর দ্বীনকে অস্বীকার করার নাম নয়। বরং এটাও একটা ধর্মীয় ও চারিত্রিক বিধান, স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দ্বীন, যাতে নিজস্ব ফরজ, ওয়াজিব, মাকরূহ ও হারাম সব রয়েছে। এজন্য কুফর ও ইসলাম দুটি দ্বীন এক স্থানে জমা হতে পারে না। একজন মানুষ একই সাথে উভয়টির অনুগত হতে পারে না। এজন্যই হয়ত কোরআনুল কারীম বর্তমান যুগের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে ইরশাদ করেছে,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٢٠٨ ﴾ البقرة: ٢٠٨

'হে মুমিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর। এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন' (সূরা বাকারা : ২০৮)

এখানে ওই ঈমানদারদের সম্বোধন করা হয়েছে যারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী নেজাম ছেড়ে দিয়ে অন্যান্য ধর্মের রীতি-নীতি ও কুসংস্কারের প্রচারক। আল্লাহর নেজামকে পেছনে ফেলে অন্য কোনো মতবাদ ও দর্শনে সফলতা অন্বেষণ করে। এটা নিছক শঠতা ও মূর্খতা। বুদ্ধিমানের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

কোরআনের নামকরণের কারণ

কোরআন শব্দটি 'কেরাআতুন' শব্দ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ জমা করা, ঘোষণা করা ইত্যাদি। কোরআন মূলত এমন এক শাশ্বত ঘোষণা যা ইলম ও হিকমত এবং সমস্ত নবী-রাসূলের শিক্ষার সার নির্যাস। কোরআনুল কারীমের নামকরণের কারণ হিসেবে এটাও বলা হয় যে, এতে সমস্ত আসমানী কিতাব এবং যাবতীয় ইলম ও হিকমতের ভাণ্ডার সঞ্চিত রয়েছে। যেমন সূরা ইউসুফের শেষ দিকে বলা হয়েছে

﴿ لَقَدۡ كَانَ فِي قَصَصِهِمۡ عِبۡرَةٞ لِّأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِۗ مَا كَانَ حَدِيثٗا يُفۡتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصۡدِيقَ ٱلَّذِي بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَتَفۡصِيلَ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ١١١ ﴾ يوسف: ١١١

'নিঃসন্দেহে তাদের সংবাদের কারণে বুদ্ধিমানদের চক্ষু খুলে যায়। এটা বানোয়াট কিছু নয়। বরং পূর্ববর্তী কালামের সত্যায়ন। আর প্রত্যেক জিনিসের বিস্তারিত বর্ণনা এবং মুসলমানদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।' (সূরা ইউসুফ : ১১১)

এর দ্বারা জানা গেল, কোরআনুল কারীমে অন্য কোনো নবীর সুসংবাদ নেই, যেমনটা আগেকার আসমানী কিতাবসমূহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সুসংবাদ পাওয়া যায়। বরং এতে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব ও নবীদের সত্যায়ন এবং মুমিনদের জন্য রহমত ও হেদায়াতের সুসংবাদ রয়েছে।

যে পবিত্র কালাম হেদায়াত ও রহমত এর জন্য বিশেষ কোনো যুগের কিংবা বিশেষ কোনো স্থানের কথা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই। বরং এতে প্রতিটি যুগ ও কালের চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয় উপকরণ বিদ্যমান। এই পবিত্র কালামের যিনি ধারক তিনিও রহমতের আধার, রহমাতুল্লিল আলামীন। যার আলোতে উদ্ভাসিত সমগ্র ভুবন। কোরআন নিজেই ঘোষণা করেছে, 'প্রকৃত অর্থে এই কোরআনুল কারীম উজ্জ্বল ও অনস্বীকারযোগ্য আয়াতসমূহের সমষ্টি, যা ওই লোকদের সীনায় যাদেরকে ইলম দেয়া হয়েছে।'

কোরআনুল কারীমে মূলত দু'ধরনের নির্দেশনা পাওয়া যায়। প্রথমত, শরীয়তের সেসব নির্দেশনা যা আকীদার সঙ্গে সম্পৃক্ত। দ্বিতীয়ত, সংবাদমূলক অর্থাৎ ঐতিহাসিক ও জ্ঞানগত তথ্য। শরয়ী উলূম এবং আকীদাগত যে নির্দেশনা এর সম্পর্ক প্রতিটি যুগে অভিন্ন থাকে এবং এতে পূর্ববর্তীদের জ্ঞান ও প্রতিভার ওপর নির্ভর করে। তবে অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে যা সম্পৃক্ত তাতে নতুনের সংযুক্তি ঘটে এবং ভবিষ্যতেও সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ অবারিত। এজন্য ওইসব বিষয়ের আয়াতের ব্যাখ্যা এ সময়ের বাস্তবতা অনুযায়ী হবে। এর ফলে কোরআনের আয়াত আরো বেশি স্পষ্ট ও বিস্তৃত হবে।

আমরা যদি অতীত দর্পনে নজর দেই তাহলে জানতে পারব, প্রাচীন যুগে মানুষের বৈষয়িক জ্ঞান ছিল অতি স্বল্প। পরবর্তী সময়ে যখনই এর মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে কোরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও আগের চেয়ে বিশুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে বুঝে এসেছে। তদুপরী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন,

﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيۡنَا بَيَانَهُۥ ١٩ ﴾ القيامة: ١٩

'কোরআনের ব্যাখ্যা আমার দায়িত্ব।' অর্থাৎ প্রত্যেক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান এর ব্যাখ্যা করতে থাকবে। এরপর সূরা হা-মীম সেজদায় বলা হয়েছে

﴿ سَنُرِيهِمۡ ءَايَٰتِنَا فِي ٱلۡأٓفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّۗ ٥٣ ﴾ فصلت: ٥٣

'বিশ্বজগতে ও তাদের নিজেদের মধ্যে আমি তাদেরকে আমার নিদের্শনাবলী দেখাব যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে, এটি (কোরআন) সত্য।' (সূরা ফুসসিলাত : ৫৩)

এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, যুগের পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোরআনুল কারীমের হাকিকত এক একটি করে প্রমাণিত হতে থাকবে।

তাফসীরে আহনাফে লেখা হয়েছে, আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন যা কিছু বিশাল বিশ্বজগতে রয়েছে তা সীমিত আত্মার জগতেও বিদ্যমান। সূরা শূরায় ইরশাদ হয়েছে

﴿ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ ﴾ الشورى: ٢٩

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং এতদোভয়ের মধ্যে তিনি যে সব জীব–জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলো। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই এগুলোকে একত্র করতে সক্ষম। (সূরা শুরা : ২৯)

উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, আসমান-জমিনে যা কিছু আছে সবকিছু আল্লাহর সৃষ্টি। আর এ কথাও প্রমাণিত যে, তিনি যেদিন চাইবেন এসবকিছু একত্রে মিলিয়ে দিবেন। এটা চাই হাশরের ময়দানে হোক কিংবা দুনিয়াতে। বিজ্ঞানের দাবী হলো, তারা চাঁদ বিজয় করেছে। তবে তাদের কথা এতটুকু পর্যন্ত সত্য যে, তারা শূন্যতার এমন এক পর্যায় পর্যন্ত লোকদেরকে পৌঁছিয়ে দিয়েছে যাকে লোকেরা চাঁদ মনে করছে। কিন্তু মূলত চাঁদ তাদের থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। বিজ্ঞান আজও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি যে, পৃথিবী ছাড়া অন্যান্য গ্রহে ও মহাকাশে কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব আছে কি-না। অথচ পবিত্র কোরআনুল কারীমের উল্লিখিত আয়াত এবং অন্যান্য আয়াতে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ, যে বিজ্ঞান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্য মেরাজকে অস্বীকার করেছিল তারাই প্রমাণ করবে, আসমানে অবশ্যই প্রাণের অস্তিত্ব আছে। আজ অমুসলিম বিজ্ঞানী-গবেষক নিজেদের চিন্তা-গবেষণা এবং প্রযুক্তির উৎকর্ষের দ্বারা চন্দ্র বিজয় করেছে, মহাকাশে তাদের পদচারণা ঘটেছে। এটা ইসলামের সত্যতা প্রমাণের জাগতিক দলীল। সাড়ে চৌদ্দশত বছর পর আজ ইসলামের সত্যতা ফুটে উঠেছে ইসলামবিদ্বেষীদের মাধ্যমে। আধুনিক বিজ্ঞানের কোনো সূত্রই ইসলামকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহর ফজলে দ্বীন ইসলামের এই শ্রেষ্ঠত্ব সমস্ত বাতিল ধর্মের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কবির ভাষায় 'ভূতালয় থেকেই কাবার রক্ষক তৈরি হয়ে গেছে।'

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

রক্ষণশীল ও সেকেলে চিন্তার ধারক যারা তারা কোরআনুল কারীমের নেজামের ওপর প্রশ্ন করবে যে, কোরআন যদি সব যুগের চাহিদাই পূরণ করে থাকে তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনবিক বোমার আলোচনা কোথাও করেননি কেন? তিনি কি ভবিষ্যতের বাস্তবতা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন না?

এ প্রশ্নের জবাবে তাদের খেদমতে আরজ করব, শুধু আমাদের নবীই নন, প্রত্যেক নবী এমন বাস্তবতা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। কেননা চিন্তাবিদরা বলেন, আল্লাহ তাআলা আলিমুল গায়েব হওয়ার বিষয়টি প্রত্যেক নবীকে অনুধাবন করান। এমনকি চোখের আড়ালের বাস্তবতাকে বাহ্যিকভাবে তাদের কাছে উপস্থাপন করে দেন– যেসব কাজ ও বাস্তবতার ওপর আমাদের বিশ্বাস হয় গায়েবের ওপর। অথচ নবীদের ঈমান হয় প্রকাশ্য দেখার ভিত্তিতে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাজের বিস্তারিত বিবরণ বিশ্লেষণমূলকভাবে উল্লেখ করেননি এজন্য যে, যুগের জ্ঞান-বিদ্যার স্তর এর জন্য সহায়ক নয়। সূরা নহলে ইরশাদ হয়েছে,

'অচিরেই আমি তোমাকে আমার নিদর্শন দেখাব তোমরা চিনে নিবে। তোমার প্রভু বে-খবর নন ওই কাজসমূহ থেকে যা তারা করে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এমন বাস্তবতার কথা উল্লেখ করতেন তাহলে সমস্যা দেখা দিত। সে যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্তর যেহেতু এত উঁচু ছিল না এজন্য লোকেরা বিভ্রান্তিতে পড়ে যেত। তখন আল্লাহর পথে দাওয়াতের মূল মাকসাদই অকেজো হয়ে যেত। শরয়ী বিধি-বিধান ও আকায়েদের প্রতি কোনো মনোযোগ থাকত না। ঈমান বিল গায়েবের প্রতি যে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তাতে সমস্যার সৃষ্টি হতো। এজন্য বিশেষ প্রজ্ঞার অধিকারী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মানুষের সঙ্গে তাদের মেধার স্তর বুঝে কথা বল'–এ নীতির ভিত্তিতে এসব আহকামের বিশ্লেষণ নিজে না করে অনাগত ভবিষ্যতের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। প্রত্যেক যুগের জ্ঞান ও গবেষণা এসব বাস্তবতার মুখোশ উম্মোচন করে যাবে। যতক্ষণ ইলম এ ব্যাপারে সাক্ষ্য না দিবে ততক্ষণ মানুষ এটাকে মিথ্যা বলেই যাবে। সূরা ইউনূসে বলা হয়েছে ,

'বরং তারা যে ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেনি, তা তারা অস্বীকার করেছে এবং এখনও তার পরিণতি তাদের কাছে আসেনি।'

এমনিভাবে পবিত্র কোরআনে নবী মূসা আ. ও খিজির-এর ঘটনা উল্লেখ আছে যে, মূসা আ.-এর সফরসঙ্গী খিজির আ. তাঁকে বললেন, এমন বিষয়ের ওপর আপনি কিভাবে ধৈর্য ধারণ করেন যা আপনার জানার গণ্ডির বাইরে।'

দ্বীনে হানীফের প্রথম দিকে দৃষ্টি দিলে জানা যায়, আল্লাহ তাআলা নবী আদম আ. কে দুনিয়াতে তাঁর খলিফা বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন সৃষ্টিজীবের প্রথম শিক্ষক। আল্লাহ তাআলা আদম আ. কে প্রতিটি বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন। শুধু বস্তুর নামই নয় এর নিগূঢ় রহস্যও বলে দিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত যেসব জিনিস আসবে সেগুলোর নামই শুধু নয়, এর একটি নমুনাও আদম আ.-এর সামনে পেশ করেছিলেন। নবী নূহ আ.কে জাহাজ নির্মাণ পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন। দাউদ আ.কে সমরাস্ত্র তৈরি এবং কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। ইবরাহীম আ.কে আসমান-জমিনের জ্ঞান দান করেছিলেন। তাঁর দ্বারা মৃতকে জীবিত পর্যন্ত করিয়েছেন।

যেমন সূরা বাকারায় চারটি পাখির ঘটনা উল্লেখ আছে। এমনিভাবে উজায়ের আ.কেও মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। মূসা আ.-এর লাঠি ও হাতের শুভ্রতা মোজেজা লাভ করেছিল। সোলায়মান আ. হাওয়ায় উড়তে পারতেন, পশু-পাখির বুলি বুঝতে পারতেন। জ্বিনদের ওপর তার পুরো কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছিল। তাঁর বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে পিপড়ারা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছিল।

মোটকথা, আল্লাহ তাআলা অসংখ্য নবী-রাসূলকে শিক্ষক বানিয়ে প্রেরণ করেছেন যারা লোকদেরকে ইলমে ওহীর শিক্ষা দিতেন। কিন্তু তারা সবাই এসেছিলেন সীমিত সময়ের জন্য, সীমিত জাতি-গোষ্ঠী কিংবা সীমিত সম্প্রদায়ের জন্য। অবশেষে একটি সময় এমন আসল যে, এ ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গেল। সর্বশেষে প্রেরণ করা হলো রহমাতুললিল আলামিন মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। যিনি কোনো কাল বা সম্প্রদায়ের জন্য গণ্ডিভূত ছিলেন না। তিনি ছিলেন কুল মাখলুকাতের অনন্তকালের নবী ও রাসূল। যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾ ﴾ الأنبياء: ١٠٧

'আমি তোমাকে একমাত্র জগতের রহমত বানিয়ে প্রেরণ করেছি।' (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)

অন্যত্র বলেন,

﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾ ﴾ الفرقان: ١

'বরকতময় ওই সত্তা যিনি কোরআন নাজিল করেছেন তার বান্দার ওপর যাতে সমগ্র ভুবনের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী হন।' (সূরা ফোরকান : ১)

এর দ্বারা জানা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত দুনিয়ার রহমত হিসেবে আবিভূর্ত হয়েছিলেন, আঠার হাজার মাখলুকাত সবারই তিনি পথপ্রদর্শক ও শিক্ষক।

যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র দুনিয়ার জন্য পথ প্রদর্শক ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন এজন্য মাখলুকের সব ধরনের জীবনপ্রণালী ও জীবনদর্শন সম্পর্কে যাবতীয় ইলম দান করা হয়েছিল। এ ধরনের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ও জানাশোনা থাকলেই কেবল সমগ্র সৃষ্টিজীবকে ভয় প্রদর্শন করা যায়। তাঁর নবুওয়ত ও রেসালাত কেয়ামত পর্যন্ত নির্ধারিত। কোরআনী নেজামও অনন্তকালের জন্য। যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তা সমস্ত দুনিয়ার জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী এজন্য তাঁকে দান করা হয়েছে এমন এক কিতাব যা সমস্ত ভুবনের নীতিমালা ও জীবনপ্রণালী সমন্বিত। যে মহান শিক্ষকের ওপর মহিমান্বিত এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তিনি এ কিতাবের শিক্ষা লোকদেরকে দিয়েছেন। এর দ্বারা তিনি লোকদেরকে শিখিয়েছেন ইলম ও প্রজ্ঞা এবং তাদেরকে করেছেন পরিশুদ্ধ।

কোরআনের নেজাম চিরন্তন ও শাশ্বত। এর অনুসারীদের জন্য অন্য কোনো নেজামের দ্বারস্থ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এই নেজামের যিনি ধারক তিনি বিশ্বনবী। তাঁর আনিত শরীয়ত চির সবুজ ও সতেজ। আমাদের উচিত শুধু তাঁর আনুগত্য করা। কারণ এর মধ্যেই আল্লাহর নৈকট্য ও মহব্বত লাভের রহস্য লুকায়িত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত আনুগত্য হলো তাঁর সঙ্গে মহব্বতের সম্পর্ক কায়েম করা। যতক্ষণ তাঁর সঙ্গে এ সম্পর্ক কায়েম না হবে ততক্ষণ তাঁর আনুগত্য করা কিংবা তাঁর নির্দেশনা মোতাবেক চলার স্পৃহা জন্ম নিবে না। কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী

فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ ﴿٣١﴾ ﴾ آل عمران: ٣١

'তোমরা আমার আনুগত্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে মহব্বত করবেন।' (সূরা আলে ইমরান : ৩১)

এর ওপর আমলকারী হয়ে গেলেই আল্লাহ আমাদের গোনাহ মাফ করে দিবেন বলে আশা পোষণ করতে পারি। সুতরাং আমাদেরকে রেসালতের উৎসমূলে অবনত হতে হবে। এর মধ্যেই আমাদের সফলতা ও কামিয়াবী নিহিত। ওই দরবার ছাড়া খালেস ইসলামের কোনো আশ্রয়স্থল পাওয়া যাবে না। দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে সীরাতে মুস্তাকিম নসীব করেন এবং তাঁর প্রিয় হাবীবের সঙ্গে প্রকৃত মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপনের তাওফিক দান করেন #

[উর্দূ সাইয়্যারা ডাইজেস্ট-এর 'কোরআন সংখ্যা' থেকে লেখাটি ছায়ানুবাদ করা হয়েছে।]